মিথ্যে নগর

মোহিত রায়

শহর কি গড়ে ওঠে না গড়া হয়? নগরায়ণ নিয়ে একেবারে ইট - কাঠের হিসেব থেকে দার্শনিক সময়স্থালন— সবই যথেষ্ট চর্চিত। এসবের পাশাপাশি সারা পৃথিবীর মানুষের লং মার্চ শহরের দিকেই। ইউরোপ আমেরিকার নগরায়ণ প্রায় সম্পূর্ণ বলা যায়, সেখানে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের বাস শহরে। এশিয়া আফ্রিকায় নগরায়ণের হার খুব দ্রুত। এ ব্যাপারে চিনের অগ্রগতি আকাশচুম্বী। যতই গ্রামের জন্য চোখের জল ফেলা হোক, ভবিষ্যৎ শহরের, সেখানেই কাজ অর্থকরী কাজ, এই বিস্ফারিত শহরে জনসাধারণের জন্য শহরের কালকাতার সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ নিয়ে এই আলোচনা।

শুরুর কলকাতা ছিল দুভাগে বিভক্ত— ইউরোপীয়ান টাউন আর নেটিভ মহল্লা। ইউরোপিয়ান টাউনের পথ - ঘাট, অট্টালিকা যতটা পরিকল্পনা - মাপিক গড়ে উঠেছিল, নেটিভদের কলকাতায় তার বালাই ছিল না। সার্বিক পরিকল্পনার কোনো ভাবনা তখন আশা করাও সঙ্গত নয়। জর্ব চার্নক কলকাতায় কুঠি তৈরির একশ বছর পর গর্ভনর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি একটি কমিটি তৈরি করে কলকাতার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগ নেন। সেই উদ্যোগের ফলে ১৮১৭ সালে একটি কমিটি গঠিত হয় যা টাউন ইম্প্রুভমেন্ট কমিটি বা লটারি কমিটি বলে পরিচিত। এই কমিটির উদ্যোগে বেশ কয়েকটি প্রধান পথ নির্মাণ ও সংস্কার, জলাশয় সংস্কার ও পার্ক তৈরি হয়। (বিনয় ঘোষ ১৯৯৭)। এর প্রায় একশ বছর পর প্লেগের দাপটে ১৯১২ সালে কলকাতায় উন্নয়নে তৈরি হয় কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (মণিদীপ চ্যাটার্জি, ১৯৯০) মৃতপ্রায় এই সংস্থাটির শেষ কাজ কলকাতার দুটি বড় সরোবর সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে শহরের পরিবেশের মুখাগ্নি করা। ১৯৬১ -তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠন করে Calcttta Metropolitan Planning Organisation (CMPO) । CMPO -র পরিকল্পনা এরপর সংশোধিত হয়ে কার্যকর হতে শুরু হয় ১৯৭০ সালে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য তৈরি করা হলো এক নতুন সংস্থা Calcutta Metropolian Development Authority (CMDA) বর্তমানে KMDA (মোহিত রায়, ২০০২ ক) কলকাতা পরিকল্পিত উন্নয়নের এরাই প্রধান হর্তাকর্তা।

তিনশ বছরের নাগরিক অস্তিত্বে কলকাতা শহরের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত নিয়ে এল ১৯৪৭ -এর দেশভাগ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসতে থাকল হিন্দু শরণার্থীর দল। ১৯৫১ -এর জনগণনায় দেখা গেল রাজ্যের জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি উদ্বাস্তু (প্রফুল্ল চক্রবর্তী, ১৯৯০ক)। মনে রাখতে হবে এই উদ্বাস্তু আগমন ছিল একতরফা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে অল্পসংখ্যক মুসলমান পূর্ব পাকিস্তান গিয়েছিলেন তাদের বেশির ভাগই নেহেরু লিয়াকত চুক্তির ফলে ফিরে আসেন। আশ্চর্য! হিন্দু উদ্বাস্তুর আগমন আর থামেনি, ৫০ বছর ধরে এখনো চলেছে (অমলেন্দু দে, ১৯৯৩)। আরো বড় আশ্চর্য যে এ নিয়ে কবি, সাহিত্যিক - বুদ্ধিজীবী - মানবাধিকাররাদী - রাজনীতিবিদ - সংবাদিক সবাই নিশ্চুপ, এই উদ্বাস্তুরা নিজেদের ন্যায্য জমি ছেড়ে এসে দখল করে নিলেন কলকাতার আশেপাশের ফাঁকা অঞ্চল, নিচু জমি, কোনো পরিকল্পনা, নকশার ব্যাপারই রইল না। কলকাতা (১৯৮৪ পূর্ববর্তী) ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এখন কলকাতার অর্ন্তভুক্ত) সরকার স্বীকৃত হিন্দু উদ্বাস্তু কলোনি ছিল মোট ৫০টি (প্রফুল্ল চক্রবর্তী, ১৯৯০খ)। কলকাতা জনভারে জর্জরিত এক শহর বলে পরিচিতি লাভ করলো।

৫০-এর দশকেই কলকাতার এই সমস্যা দূর করার জন্য দুটি সম্পূর্ণ নতুন শহর তৈরির কথা ভাবা হলো। নদিয়া জেলায় অবস্থিত কলকাতা থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে কল্যাণী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সাময়িক বাহিনীর অধিকৃত অনেক জমি পাওয়া গেল সহজেই। সেখানে তৈরি হলো বিশ্ববিদ্যালয়, বড় হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, উদ্যান, শিল্পাঞ্চল। কল্যাণী উপনগরী তৈরি হয়েছিল ২ থেকে ৩ লক্ষ লোকের জন্য, সে শহরে ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কল্যাণীতে জমি কিনতে বাড়ি বানাতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কদিনেই সেই উদ্যম থিতিয়ে এলো। কল্যাণীকে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত করার সক্রিয় উদ্যোগ কখনই নেওয়া হয় নি। এই শহর এখন কলকাতার কিছু অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষের আবাস, এমনকি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও এই ঘুমন্ত শহরে থাকেন না। শিল্পাঞ্চলও প্রায় শেষ। ষাটের দশকের শুরুতে যখন কল্যাণী গড়ে উঠেছিল, কলকাতা ও কল্যাণীর মধ্যে শহরগুলি তখনো তত জনবহুল হয়ে ওঠেনি। কল্যাণী পরিকল্পনা - মাফিক গড়ে উঠলে কল্যাণীকে কেন্দ্র করেই চারদিকে ছোট শহরগুলি বৃদ্ধি পেত। কলকাতা - কেন্দ্রিক চাপটা কমতো। কিন্তু কলকাতা - কেন্দ্রিক আমলা, সরকারি কর্মচারি, দূরদৃষ্টিহীন বড় দুটি ক্ষমতাসীন দল— কেউই এই উদ্যোগকে সফল করতে আগ্রহী ছিলো না।

অন্য পদক্ষেপ নেওয়া হলো কলকাতার সীমানাকে আরো পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দিতে। লবণ হ্রদ বা সল্টলেক, কলকাতার পূর্ব প্রান্তের বিস্তৃত জলা অঞ্চল, দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতার পরিকল্পনাকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এক সময় শহরের মশা-মাছিও বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ বলে ধরা হত এই জলা অঞ্চলকেই। এর সংস্কার, ব্যবহার ও বোজানোর ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা ও কমিটি গঠিত হয়েছে গত দেড়শ বছর ধরে (হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯০ক)। সুতরাং স্বাধীনতা পরবর্তী নির্মাণমুখী সময়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়কে এই অঞ্চল নির্বাচনে হয়ত সমস্যায় পড়তে হয় নি, যদিও এই জলা ভরানোর কারিগরি দিকটি খুব সহজ ছিল না। এই লবণ হ্রদ অঞ্চলের ১২৫০ হেক্টর মাছের ভেড়ি বুজিয়ে তৈরি হল সল্টলেক। নগর নির্মাণের দৌলতে লবন হ্রদ এই বাংলা নামটা প্রায় হারিয়েই গেল। সল্টলেক চালু নাম, এখন সরকারি নাম হয়েছে বিধাননগর। অবশ্য বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটির আয়তন আরো বড়, ২০২৪ হেক্টর। ১৬ এপ্রিল, ১৯৬২ সল্টলেক স্থাপনের সূচনা করেন বিধানচন্দ্র রায়। এর কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

গরবী মানুষদের ঠিকানা সল্টলেক?

সল্টলেক গড়ার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল গৃহহীন নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষদের বসবাসের ব্যবস্থা করে কলকাতার উপর চাপ কমানো এবং একটি পরিকল্পিত নগরী গড়া। সল্টলেক নির্মাণের সাথে যুক্ত কমিটির রিপোর্টে এ কথা সরকারিভাবেই লিখিত হয়েছে। সল্টলেক পুনরুদ্ধার ও নগর সম্প্রসারণ প্রকল্পের ১৯৬৫-৬৬-র রিপোর্টে বলা হল যে ২ লক্ষ গৃহহীন মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (Report of the Estimates Committee, 1965 - 66, 6th Report)। এই রিপোর্টেই বলা হল যে 'নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য সহজ কিস্তিতে ও ভর্তুকি দিয়ে' ফ্ল্যাট বিক্রি করা হবে ও এজন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বহুতল বাড়ি নির্মিত হবে। রিপোর্টে আরো বলা হল যে মধ্য আয়ের মানুষদের পক্ষেও হয়ত জমি কিনে বাড়ি করা সম্ভব হবে না সুতরাং তাদের জন্যও বহুতল বাড়ি নির্মাণ

প্রয়োজন। কেবল মাত্র উচ্চ আয়ের মানুষদের জন্য অল্প কিছু ৭ থেকে ১০ কাঠার জমি রাখা হবে। **সল্টলেককে বলা হলো নিম্ন ও মধ্য আয়ের পরিবারদের জন্য একটি উপনগরী।** Calcutta Metropolitan Planning Organisation (CMPO) -র একটি নোটে বলা হল যে এই ব্যবস্থা বিভিন্ন আয়ের মানুষদের গৃহসমস্যা সমাধানে সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নেওয়া হয় নি বরং সাধারণবাবে এতেই সল্পলেকের জমি ব্যবহারের সর্বাধিক অর্থনৈতিক সুবিধা রাজ্য পাবে বলে ধরা হয়েছিল (হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯০ খ)। ১৯৮২ সালে বর্তমান বামপন্থী সরকারের প্রকাশিত Salt Lake City (Bidhan Nagar) -Calcutt's Eastern Garden Suburb - অনুযায়ী সল্টলেকের প্রস্তাবিত জনসংখ্যা বলা হয়েছিল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। বিধাননগর বা সল্টলেকে সরকারি ওয়েবসাইটে এখনও বড় গলায় জানানো হয়েছে যে এই নগরী ৪,৫০,০০০ মানুষের বসবাসের জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল (পঃবঃ সরকারের নগর উন্নয়ন বিভাগের ওয়েবসাইট)। সংখ্যাটা স্রেফ একটা বলবার জন্য সংখ্যা নয়, সল্টলেকের সেক্টর অনুযায়ী হিসেব করে এই সংখ্যা জানিয়েছিল রাজ্য সরকারের পুস্তিকা (Salt Lake City, Bidhan Nagar) Calcutta's Eastern Garden Suburb । হিসেবটা এরকম–

সল্টলেক	আয়তন (হেক্টর)	প্রস্তাবিত জনসংখ্যা	প্রস্তাবিত জনঘনত্ব* প্রতি বর্গ কিলোমিটারে	১৯৮১ সালে কলকাতার জনঘনত্ব** প্রতি বর্গকিলোমিটারে
সেক্টর ১	৩৭৪	১৭৫০০০	৪৬৭৯১	
সেক্টর ২	২৬২		৩৬২৬০	
সেক্টর ৩	৩৭৩	১৬৫০০০	৪৪২৩৬	
সেক্টর ৪ ও ৫***	২৪৩	১৫০০০	৬১৭৩	
মোট	১২৫২	৪৫০০০০	৩৫৯৪৩	৩১৭৭৯
*জনঘনত্ব জনসংখ্যা ও আয়তন অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে				

** Calcutta Metropolitan Development Authority - Plan for Metropolitan Development, 1990-2015, p-2 - 5, Calcutta, Augast, 1990

*** সেক্টর ৪ ও ৫ শিল্পাঞ্চল — বসবাসের অঞ্চল নয়।

অর্থাৎ যখন সল্টলেক পরিকল্পনা করা হয়েছে ও নির্মাণ হচ্ছে তখন এটি একটি কলকাতার থেকেও জনবহুল নগরী হিসেবে ভাবা হয়েছে। বহুতল বাড়ি তৈরি করে ও পরিকল্পিত রাস্তা, পার্ক, স্টেডিয়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা রেখে স্বল্পবিত্ত নাগরিকদের জন্য একটি জনবহুল আধুনিক বাসযোগ্য নগরীর স্বপ্ন দেখা হয়েছে। ১৪ জন ভেড়ি মালিক, বিদ্যাধরী স্পিল মৎসজীবী সমবায় সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগের ১২৫০ হেক্টরের জলাজমি ও ৪৯৭৯ মৎসজীবীর কর্মসংস্থান কেড়ে নিয়ে এই নগরীর পত্তন হলো ১৯৭০ সালে। কিন্তু সেই স্বপ্নের কি হল?

সল্টলেকে বড় বড় পার্ক স্টেডিয়াম, সরকারি অফিস, শিল্পাঞ্চল, ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের জমি বন্টন — সবই হল, কিন্তু নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষদের বসবাসের কিছুই হলো না। এখন আশেপাশের আরো কিছু গ্রামীণ - আধা - গ্রামীণ মৌজা নিয়ে ২০২৪ হেক্টর বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ২২১ জন। জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ৮১১৪। রাজ্য সরকারের সাথে যুক্ত সব আমলা, বিচারপতি, ইঞ্জিনিয়ার সবাই সল্টলেকে থাকা বেশি আভিজাত্যের ব্যাপার। গরীবদের জন্য লোকদেখানো গোটা দুয়েক হাউজিং এস্টেট। ৪,৫০,০০০ জনের জমি দেড় লক্ষ লোককে বিলিয়ে দেওয়া হয়। এ নিয়ে কোন মহলে কোনদিন হৈ চৈ হয় নি। বরং এখন সল্টলেক নিবাসিরা সল্টলেককে আরো জনবহুল না হবার জন্য শপিং মলের বিরোধিতায় নেমেছেন। আসলে ওনারা কলকাতার শপিং মলে বাজার করবেন, সল্টলেককে নির্জন রাখবেন। অথচ এখন সল্টলেকে আরো ৩,৫০,০০০ গরীব মানুষের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা দরকার।

রাজারহাট

সল্টলেকের এইসব শিক্ষা নিয়েই ভাবা হলো নতুন উপনগরী রাজারহাটের কথা। কোন বিকেন্দ্রীকরণের ঝুঁকি নয়, একেবারে সল্টলেকের গায়ে খাল পেরিয়েই রাজারহাট ব্লকের গ্রামাঞ্চল হল নতুন লক্ষ্য। এবারও সেই গরীব মানুষের বাসস্থানের কথা বলা হবে, কলকাতার চাপ কমানোর কথা বলা হবে— আর এ জন্য নতুন উপনগরী তৈরি করতে জনস্বার্থ, পরিকল্পনা, পরিবেশ, আইনকানুন এসবের বিশেষ তোয়াক্কা করা যাবে না। এবার আমরা প্রবেশ করবো রাজারহাটে। সেখানে পাথরঘাটা মৌজার লোকেরা এখনো মনে রেখেছেন পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ভাষণ — ১০ লক্ষ লোকের জন্য ১ লক্ষ লোককে আত্মত্যাগ করতেই হতে পারে।

টাউন এ্যান্ড কানট্র (প্লামিং এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট) আইন অনুযায়ী সি. এম. ডি. এ. হলো বৃহত্তর কলকাতার পরিকল্পনাকার। কলকাতার তথাকথিত তিনশ বছর পূর্তিতে ১৯৯০ সালে সি. এম.ডি.এ. পরবর্তী পঁচিশ বছর অর্থাৎ ১৯৯০-২০১৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোপলিটান অঞ্চলের একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা রিপোর্ট প্রকাশ করল। সি.এম.পি.ও -র ১৯৬৬ -৬৮-র বেসিক ডেভেলপমেন্ট অঞ্চলের কোন অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের কাজ করা হবে, কোথায় আর উন্নয়ন করা উচিত নয় এবং ভবিষ্যৎ জমির ব্যবহার কেমন হবে — এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হলো। সি.এম.ডি.এ. -র রিপোর্ট যে শুধু কোথায় উন্নয়ন হবে তাই নির্দিষ্ট করেনি, কোথায় হওয়া উচিত নয় তাও পরিষ্কার করে বলেছে। ঐ রিপোর্টে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কেন্দ্রগুলি নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, কলকাতার পূর্ব ও দক্ষিণে যে অপরিকল্পিত উন্নয়ন শুরু হয়েছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। রিপোর্টে লেখা হয়েছে - ''ডায়মন্ড হারবার রোড ও রাজা সুবোধ মল্লিক রোডের প্রশস্তকরণ এবং ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের নির্মাণ দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের যোগাযোগকে সহজ করেছে। এর ফলে জমির হস্তান্তর ও উন্নয়নকার্য শুরু হয়ে গেছে। যথেচ্ছভাবে সবুজ এলাকা, জলাশয়, জলাভূমি দখল হয়ে যাচ্ছে। এই ঝোঁকটিকে রুখতে হবে এবং উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। ইতিমধ্যে পূর্ব কলকাতার ৫৫০০ হেক্টর জমি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উন্নয়নের গতিমুখকে পাল্টে উত্তর ও পশ্চিমমুখী করতে। (C.M.D.A. 1990) সি. এম. ডি.এ. পূর্ব - কলকাতাকে নগরায়ণের বাইরে রাখবারই পরিকল্পনা করল। ভবিষ্যৎ জমি ব্যবহারের একটি মানচিত্রও তৈরি করা হলো। ঐ রিপোর্টের

নবম অধ্যায়ে জমি ভবিষ্যৎ ব্যবহারে বলা হলো যে চাষের জমি, জলাভূমি ও বড়ো জলাশয়কে উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর কোথায় কোথায় উন্নয়ন করতে হবে সে সব জায়গাও চিহ্নিত করা হলো মানচিত্রে। না সেই উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত স্থানগুলিতে রাজারহাটের নাম ছিল না।

এই পরিকল্পনা তৈরি হবার সময়েই কসবায় ইস্ট ক্যালকাটা টাউনশিপ নামে সি.এম.ডি.এ. -ই বাইপাসের দক্ষিণ - পূর্বে গড়ে তুলেছে নতুন ঘরবাড়ি। এখানে রয়েছে একটি শিল্পাঞ্চল, অনেক আবাসন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অফিস, হাসপাতাল। এইসব উন্নয়নের জন্য কোনোরকম পরিবেশ মূল্যায়ন করা হয়নি। এরপর শুরু হয়ে গেল বাইপাসের দু- পাশে নতুন নতুন প্রকল্প। এর মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত প্রকল্প হল সায়েন্স সিটি। ধাপা অঞ্চলে আবর্জনা - ভরাট জমিতে গড়ে তোলা হলে বিজ্ঞান - প্রদর্শনী কেন্দ্র। পরিবেশের প্রয়োজনায় নিয়মগুলিকেই অস্বীকার করে (মোহিত রায়, ১৯৯৭)। ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চলের আবর্জনা ব্যবহারকারী ক্ষেতগুলোও নিয়ে নেওয়া হলো পাঁচ তার হোটেল ও শিল্প প্রদর্শনীর জন্য। আরো দক্ষিণে তৈরি হলো সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইন্সটিটিউট। শুধু একটি ব্যাপারেই পূর্ব - কলকাতা আপাতত রক্ষা পেয়েছে। তা হলো জলাভূমি সংরক্ষণে। বছর দশেক আগে একটি বেসরকারি সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ও প্রদর্শনী গড়ার জন্য একটি অব্যবহৃত ভেড়ি নির্বাচন করে। বিষয়টি জনসমক্ষে এলে এ নিয়ে অনেক আলোচনা বিতর্ক হয়। PUBLIC (People United for Better Living in Calcutta) নামে নামে একটি সংস্থা বিষয়টি নিয়ে কলকাতা উচ্চ আদালতে যাক। কয়েক বছর ধরে মামলা চলার পর পূর্ব-কলকাতার ভেড়িগুলি ও নোংরা জলে চাষ করা কৃষিজমিগুলির ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন নিষেধের আদেশ দেয় আদালত। এই অংশটিকে বলা হচ্ছে বর্জ্য পুনশ্চক্রায়ন অঞ্চল Waste Recycling Region। সি.এম.ডি.এ. -র পরিকল্পনা নয়, কিছু পরিবেশপ্রেমী নাগরিক ও আদালতের সাহায্যে পূর্ব - কলকাতার একটি অংশের ভাগ্য আপাতত অপরিবর্তিত রইল।

১৯৯৫ সালের ১ জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে রাজারহাট থানার ২১টি মৌজার ২৭৫০ হেক্টর জমি নিয়ে এই নতুন শহর স্থাপনের কথা ঘোষণা করে। এরপর সেটি বেড়ে হয়েছে ৩০৭৫ হেক্টর। এক দশক পরে এখন রাজারহাটের দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত্র, বিরাট সব মাছের জলা ভেড়ি, মানুষের ঘরবাড়ি, জঙ্গল, বাগান অনেকটাই শুনশান করে পড়ে আছে ন্যাড়া মাঠ, মাঠ চিরে চওড়া কালো রাস্তা, আর নতুন আকাশছোঁয়া অট্টালিকার কোলাহল। ক্রেন, ডাম্পার, বুলডোজার, ট্রাকের ঘোরাফেরা এদিক সেদিক, প্রশস্ত সড়ক বিমানবন্দরের উদ্দেশে প্রায়ই উড়ে যাচ্ছে নতুন মডেলের মোটরগাড়ি। তবু বিমানবন্দর থেকে নিউ টাউনের চওড়া রাস্তায় একটু ঢুকলেই দুপাশের ন্যাড়া মাঠের মাঝে এখনো দেখা যাবে হোগলার জঙ্গল মাথা নাড়ছে, বুলডোজারের ঔদ্ধত্যকে উপেক্ষা করে পুরোনো জলার সত্য আবার প্রকাশিত, এখনো এধার ওধারে জলা - পুকুরে ফুটে আছে শাপলা। জলার পাড়ে কাদা মেখে খেলতে খেলতে শিশুরা দেখছে দিল্লি পাব্লিক স্কুলের প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে। ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বা হিডকো তৈরি করে এই নতুন শহর গড়ার জন্য। এই সংস্থাকে জমি কেনা বেচার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েচে। এই নতুন শহর চালানোর দায়িত্বও এখন এই সংস্থার। এতদিন রাজারহাট পাল্টে নতুন শহরের নাম হয়েছে নিউ টাউন।

নিউ টাউনের অবস্থা সল্টলেক বা বিধাননগরের পূর্ব, উত্তর - পূর্বদিকে মূলত রাজারহাট ব্লক ও স্বল্পাংশ ভাঙর -২ ব্লকে। সল্টলেকের মূল ব্যবসায়িক এলাকা থেকে ৫ কিলোমিটার এবং কলকাতার মূল ব্যবসায়িক এলাকা থেকে ১০ কিলোমিটার পেরোলেই রাজারহাটের গন্ডি এসে যাবে। ফলে বিজ্ঞাপনে একে কলকাতার পাশেই এক নতুন কলকাতা বলেই পরিচিত করানো হচ্ছে। হিডকো জানাচ্ছে **'নিউ টাউনের উদ্দেশ্য সবার জন্য, বিশেষত নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনসাধারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বাড়ি বানানোর জমি তৈরি করে দেওয়া'**। এই প্রচারপত্রে ও হিডকোর অন্যান্য প্রকাশনার জানানো হচ্ছে যে 'সম্পূর্ণ হবার পরে এখানে সাড়ে ৭ লক্ষ লোক বসবাস করবে' (HIDCO)। সত্যি যদি সাড়ে ৭ লক্ষ লোক নিউ টাউনে বসবাস করে তাহলে নিউ টাউনের জনঘনত্ব হবে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৪৩৯০ জন, ঠিক কলকাতার মতনই জনবহুল।

	প্রস্তাবিত জনসংখ্যা	প্রকৃত জনসংখ্যা**	প্রস্তাবিত জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে	প্রকৃত জনঘনত্ব*** প্রতি বর্গকিলোমিটারে
কলকাতা পুরসভা	---	৪৫,৭২,৮৬৭	.....	২৪,৭১৮
বিধাননগর পুরসভা	৪,৫০,০০০	১,৬৪,২২১	২২,২৩৩***	৮,১১৩
নিউটাউন, রাজাহাট	৭,৫০,০০	....	২৪,৩৯০	???

* জনগণনা - ২০০১

** প্রস্তাবিত জনসংখ্যা ছিল মূল সল্টলেকের ১২৫০ হেক্টরের জন্য। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জনঘনত্ব হবে ৩৬০০ (লোক/বর্গ কিমি.) কলকাতার দেড়গুণ বেশি।

*** ১৯৮৪ সালে কলকাতা পুরসভায় আরো নতুন অঞ্চল যুক্ত হওয়ায় ২০০১ সালে কলকাতার জনঘনত্ব ১৯৮১-র থেকে কমে গেছে।

কি থাকবে এই নতুন শহরে? হিডকো-র বৈদ্যুতিন প্রচার জানাচ্ছে যে তৈরি হবে প্রশস্ত রাজপথ, বাণিজ্যিক অঞ্চল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অনেক বড় বড় আবাসন, স্টেডিয়াম, বৃহৎ জলাশয় - সহ উদ্যান ইত্যাদি। এসব কাদের জন্য?

প্রকল্প উদ্বোধনের সময় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছিল (পরে ২০০০ সালে তৈরি পরিবেশ মূল্যায়ন রিপোর্টেও হুবহু একই কথা রয়েছে) যে—

১। এই প্রকল্পের অঞ্চলটি (প্রথমে বলা হয়েছিল ২৭৫০ হেক্টর, পরে ২০০০ সালে তৈরি রিপোর্টে যা হয়েছে ৩০৭৫ হেক্টর) অব্যবহৃত (vacant) এবং কম উৎপাদনশীল কৃষি জমি।

২। এই প্রকল্পের অঞ্চলে কোন মাছে ভেড়ি বা জলাভূমি নেই।

সরকারি তথ্যেই প্রকল্প অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ২২'৩৩" থেকে ২২'৩৭" উত্তর অক্ষরেখা ও ৮৮'২৭" থেকে ৮৮'৩২" পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে। রামসার জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্যপত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির অবস্থান ২২'২৫" থেকে

২২'৪০" উত্তর অক্ষ রেখা ও ৮৮'২০" থেকে ৮৮'৩৫" পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে। রামসার কর্তপক্ষকে এই তথ্য দিয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার ইন্ডিয়া। ১৯ আগস্ট, ২০০২ -এ পূর্ব কলকাতার জলাভূমি রামসার জলাভূমি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং এই হিসেব মত পুরো প্রকল্পের অঞ্চলটিই জলাভূমি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। ১৯৯৮ -এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দফতর প্রকাশিত Status of Environment in West Bengal -এ বলা হয়েছে যে প্রস্তাবিত রাজারহাট উপনগরী পূর্ব কলকাতার জলাভূমির মধ্যেই পড়বে, এর জন্য এই প্রকল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ মুল্যায়ন (critical appraisal) প্রয়োজন।

এ অঞ্চলের বিল, ঝিল, পুকুর, ভেড়ির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দফতরের সহ - অধিকর্তা ড. মুধমিতা মুখার্জী। তিনি জানিয়েছেন যে উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র অনুসারে রাজারহাট অঞ্চলও জলাভূমি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। তিনি তারুলিয়া মৌজার ৮১টি ও মহিষগোঠ মৌজার ২১টি ব্যক্তি মালিকানার জলাশয়ের তালিকা দিয়েছেন। রাজারহাটের বিল, ঝিল, পুকুর, ভেড়িতে পাওয়া ৫৩টি প্রজাতির মাছের একটি তালিকাও উনি তৈরি করেছেন, এর মধ্যে ১১ টি বিপন্ন (endangered) প্রজাতি ও ২৮টি দুর্লভ (rare) প্রজাতির মাছ রয়েছে। এররম আদর্শ জলাভূমি মাছের চাষের অঞ্চল বলে উপনগরী স্থাপনের বিপরীতে মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে এইসব বিল জলা ভেড়ি অক্ষুন্ন রেখে একটি জলাভূমির প্রদর্শনাগার তৈরির প্রস্তাবও তিনি দিয়েছিলেন (মধুমিতা মুখার্জী, ২০০০)।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Buerau of Applied Economics & Statistics-এর ২০০৩ সালের District Statistical Handbook থেকে জানা যাচ্ছে যে এই উপনগরীর কাজকর্ম শরু হওয়া সত্ত্বেও ২০০২ - ০৩ সালের রাজারহাট ব্লকের মাছ চা,ের চিত্রটা ছিল নিম্নরূপ,

রাজারহাট ব্লকে মাছের চাষ (২০০৩)			
	মাছ চাষের এলাকার আয়তন (হেক্টরে)	মাছ চাষের সাথে যুক্ত জনসংখ্যা	আনুমানিক বার্ষিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
রাজারহাট ব্লক	৫৬৮	১২,৭৭০	১১,২৫৯

সুতরাং সরকারি সর্বশেষ পরিসংখ্যান যখন ২০০৩ সালেও ১২৭৭০ জন মৎস্য চাষীর খবর দিচ্ছে তখন হিডকো-র ২০০০ সালের পরিবেশ মূল্যায়ন রিপোর্ট বলেছে এখানে কোন মাছের ভেড়িই নেই। রাজারহাট অঞ্চলের জলাভূমি, মাছ চাষের অনেক ছবি তুলে সেগুলিকে বিভিন্ন জায়গায় কম্পিউটার প্রজেকশনে দেখিয়ে সবার ধন্যবাদার্হ হয়েছেন সি বি আই - এর পূর্বাঞ্চলের তৎকালীন অধিকর্তা শ্রী উপেন বিশ্বাস। এত কিছুর পর নিউ টাউনের প্রথম পর্যায়ের ৬২২ হেক্টর জমিতে আবাসন গড়তে আবাসন দফতর ৩৩টি পুকুর বোজানোর আবেদন করেছেন মৎস্য দফতরের কাছে।

শহর গড়ার যুক্তি সাজাতে সরকারি ভাষ্যে বলা হলো এটি খালি এবং কম উৎপাদনশীল কৃষি জমি। দক্ষিণবঙ্গের এ রকম জায়গায় খালি জমি প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। জলা ও বাস্তু ছাড়া সবাই কৃষি জমি। কোনো কোনো জলাতে শুকনো সময়ও চাষ হয়। কি রকম চাষ হয়? এখানে জমি তিনফসলা। ধান, গম, পাট, সরষে, আখ, তিল সব ধরনের চাষই হয়। এছাড়া এখানকার কয়েকটি মৌজা ফুলের চাষের জন্য বিখ্যাত, বিদেশেও রপ্তানি হয়। এছাড়া সরকারি নথিতেই এখানে খাল থেকে জল তুলে সেচ (river lift irrigation), ডিপ টিউবওয়েল, শ্যালো টিউবওয়েল সব ধরনের সেচ ব্যবস্থার কথা রয়েছে Bureau of Applied Economics & Statistics -এর ২০০৩ সালের District Statistical Handbook থেকে জানা যাচ্ছে ঃ

কৃষি ও মৎস্য চাষে যুক্ত জনসংখ্যা (২০০৩)			
	মোট কর্মী	চাষী ও কৃষি শ্রমিক	মাছচাষের যুক্ত
রাজারহাট ব্লক	৪৩৯১৮	১১৪৭৮ (২৬ শতাংশ)	১২৭৭০ (২৯ শতাংশ)

অর্থাৎ এ অঞ্চলের ৫৫ শতাংশ বা অর্ধেকের বেশি লোকের জীবিকা জমি ও জলানির্ভর। এই জানাল ও জমি চলে গেলে মানুষের ভরসা আর থাকে না।

রাজারহাটের জমি নিয়ে সরকার কাদের দিচ্ছেন? হিডকোর দেওয়া সরকারি তথ্য এরকম ঃ

রাজারহাট ব্লকে মাছের চাষ (২০০৩)			
	জমির ব্যবহার	আয়তন (হেক্টর)	মোট জমির শতাংশ
ক	আবাসন ও তার সংলগ্ন রাস্তা, ফাঁকা জমি এবং সামাজিক পরিষেবা	১৫৫৫	৫০.৫
খ	শিল্প	২০০	৬.৫
গ	বাণিজ্যিক অঞ্চল	১৪০	৪.৬
ঘ	শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিকিৎসা	২০	০.৭
ঙ	রাস্তা ও পরিবহন কেন্দ্র	৩০০	৯.৭
চ	ফাঁকা জমি, উদ্যান, জলাশয়	৮৬০	২৮.০
	মোট	৩০৭৫	১০০

উপরের হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষের জন্য বা অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প ও বাণিজ্যের জমির ভাগ মাত্র ১১ শতাংশ, সাকুল্যে ৩৪০ হেক্টর। শুধু একটুর জন্য রাস্তাঘাট তৈরি করেত আরও ৬০ হেক্টর জমি লাগাতে পারে। মোট ৪০০ হেক্টর কিন্তু বাকী ৮৭ শতাংশ জমি অর্থাৎ ২৬৭৫ হেক্টর জমি একেবারেই ধনী ও উচ্চবিত্তদের আবাসন, বিনোদন, শিক্ষা, চিকিৎসা

ইত্যাদির জন্য। একেবারে সল্টলেক মডেল, সেখানেও মাত্র ৬ শতাংশ জমি রয়েছে শিল্প ও সরকারি অফিসের জন্য। এর সাথে সল্টলেকের জমি বন্টন একেবারে মিলে যায়। সল্টলেকের ৫টি সেক্টরে বিভক্ত ১২৫০ হেক্টর জমির বন্টন নিম্নরূপ (শতাংশ)ঃ

আবাসন - ৫০.০ শতাংশ, রাশতাঘাট - ১০.০ শতাংশ, উদ্যান - ১২.১ শতাংশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য - ৩.৯ শতাংশ, সামাজিক, সমবায় ব্যবহার - ৫.১ শতাংশ শিল্প ও সরকারি অফিস - ৫.৯ শতাংশ

এবারও তাহলে ধনী, উচ্চবিত্ত, সরকারি আমলাদের জন্য দরিদ্র কৃষককে আত্মত্যাগ করতে হবে?

গ্রন্থপঞ্জী

- অমলেন্দু দে, ১৯৯৩, প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ, পৃঃ ৩, বর্ণ পরিচয়, কলকাতা
- প্রফুল্ল চক্রবর্তী, ১৯৯০ক, The Marginal Men, p-3, Lumiere Books, Kolkata
- প্রফুলল্ল চক্রবর্তী, ১৯৯০খ, The Marginal Men, p-492, Lumiere Books, Kolkata
- পঃবঃ সরকারের নগর উন্নয়ন বিভাগের ওয়েবসাইট— http://www.wburbandev.gov.in/htm/saltlake.htm
- বিনয় ঘোষ, ১৯৯৭, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত - ৩য় সংস্করণ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬৭ - ১৬৯, বাকসাহিত্য, কলকাতা
- মণিদীপ চ্যাটার্জী ১৯৯০, Town Planning in Calcutta - p - 139, In Calcutta the living city, vol.II, Oxfordf University Press, Kolkata
- মধুমিতা মুখার্জী ঃ 'উন্নয়নের অন্য পথ - রাজারহাট' - বিপন্ন পরিবেশ। নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা ২০০০।
- মোহিত রায়, ২০০২ক বিতর্কের পরিবেশ, পরিবেশ নিষেধ - পৃঃ ৪৪-৪৫, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা
- মোহিত রায়, ১৯৯৭, এবার ধাপার পালা, -উৎস মানুষ কলকাতা
- হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯০ক, From Marsh to Township East of Calcutta, p-90-95, K.P. Bagchi &Co. Kolkata
- হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৯০খ, From Marsh to Township East of Calcutta, p-105, K.P Bagchi & Co. Kolkata
- Calcutta Meropolitan Development Authority - Plan for Metropolitant Development, 1990-2015, p-8-6, Calcutta, August, 1990
- HIDCO - Http://www.westbengal.gov.in/hidco/introduction.htm
- Report of the Estimates Committee, 1965-66, 6the Report, Salt Lake Reclamation, City Expan sion Project, - From Marsh to Township East of Calcutta, p - 90-95, - Haraprasad Chattopadhyay, pp-84, K P Baghci & Co. Kolkata. 1990
- port of the Status of Environment in West Bengal : Department of Environment, Government of West Bengal, September, 1998.
- Salt Lake City (Bidhan Nagar) - Calcutt's Eastern Garden Suburb - 1982, p-25, Government of West Bengal.